৩৬তম স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

গণভবন, ঢাকা।
বুধবার
৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪
১৭ই মে ২০১৭।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রিয় দেশবাসী,

আসসালামু আলাইকুম।

প্রায় ৬ বছর বিদেশের মাটিতে রিফিউজি হিসেবে থেকে আমি এইদিন বাংলার মাটিতে ফিরে এসেছিলাম। আমি আজকের দিনে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। '৭৫ এর ১৫ই আগস্ট বাবা-মা, ভাই সব হারিয়েছি। সব হারিয়ে নিঃস্ব রিক্ত হয়ে বিদেশে ছিলাম। আজকে বার বার তাঁদের কথাই মনে পড়ছে। কখন ভাবতেও পারিনি যে, এ রকম ঘটনা আমাদের জীবনে আসবে।

মাত্র ১৫ দিন আগে আমি আর রেহানা দেশ ছেড়ে বিদেশে গিয়েছিলাম। অল্প সময়ের জন্য গিয়েছিলাম। চলে আসার কথা। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে আর আমরা ফিরতে পারলাম না। কারণ, '৭৫ এই কালো দিনটি আমাদের সবকিছু কেড়ে নিল। শুধু যে আমরা হারিয়েছি, তাতো না। বাংলাদেশের জনগণ যে স্বপ্ন নিয়ে, যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জাতির পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে অস্ত্র তুলে নিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছিল। স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে যে একটা মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হবার আকাঙ্ক্ষা ছিল। ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত একটি সমাজ গঠন করা। বাংলাদেশকে উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার জাতির পিতার যে স্বপ্ন ছিল, তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়া হলো '৭৫-এ। প্রতি রাতে কারফিউ। যাঁরা মুক্তিযুদ্ধ করেছে সামরিক বাহিনী থেকে শুরু করে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য থেকে শুরু করে সবাই যে যেখানে ছিল তাঁদের খুঁজে খুঁজে নির্মমভাবে হত্যা করা। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার। তাঁদের উপর অকথ্য অত্যাচার নির্যাতন চালায়।

এই ঘটনাগুলি '৭৫ এর পর থেকে বছরের পর বছর ঘটে চলেছিল। আসলে যখন এই ঘটনাটা আমরা শুনলাম, তখন একদিকে যেমন স্বজন হারানোর বেদনা আবার

অপরদিকে বার বার মনে হচ্ছিল এই দেশটার জন্য তো আমার বাবা সারাটা জীবন কষ্ট করেছিল। আমরা সন্তান হিসেবে একটানা ২ বছর বাবাকে কাছে পাইনি।

যে বয়সে ছেলেমেয়ে স্কুলে বাবার হাত ধরে, আমাদের সে সৌভাগ্য হয়নি।

যখন থেকে জ্ঞান হয়েছে বাবার সাথে দেখা হলো, কোথায়? জেলখানায়-কারাগারে। স্কুল জীবনে, কলেজ জীবনে, ইউনিভার্সিটি জীবনে, সবসময় ঐ কারাগারে গিয়েই সাক্ষাৎ পেতে হতো।

যিনি একটি জাতির জন্য একটি দেশের জন্য এতো ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। নিজের জীবনের দিকে একবারও ফিরে তাকাননি। নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা কোন কিছু ছিল না। সবকিছু বিলীন করে দিয়েছিলেন এ দেশের মানুষের জন্য। মানুষের স্বার্থে। বাংলাদেশের মানুষের তখন কি অবস্থা ছিল। দেশের ৮০/৯০ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যের নীচে ছিল। এ দেশের মানুষের খাবার নেই, বাসস্থান নেই। এমনি একটি অবস্থায় এদেশের মানুষ। এ দেশের মানুষের ভাগ্য গড়ার জন্যইতো তিনি সবকিছু ত্যাগ করেছিলেন এবং বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে তিনি স্বাধীনতা এনে দেন। এই স্বাধীনতার জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল। আওয়ামী লীগের অগণিত নেতা কর্মী তারাও কম অত্যাচার নির্যাতনের স্বীকার হননি। কিন্তু সেই স্বাধীন দেশে সেই স্বাধীন মাটিতে তাকে হত্যা করা হলো। যেটা তিনি কোনদিন বিশ্বাস করতে পারেননি, ভাবেননি। অনেকেই তাকে সাবধান করেছিলেন। এ রকম একটা ঘটনা ঘটতে পারে। কখনও বিশ্বাস করতেন না। বলতো ‘‘না, ওরা তো আমার ছেলের মতো। আমাকে কে মারবে?’’ যিনি বাংলাদেশের জনগণকে এতটা ভালোবাসা দিয়েছিলেন। তাদেরই কিছু একটা বিক্ষিপ্ত অংশ তাদের গুলিতেই জীবন দিতে হল।

আমার এখনও মাঝে মাঝে মনে হয় আব্বা যখন দেখেছিলেন তাঁকে গুলি করছে তাঁরই দেশের লোক। তাঁরই হাতে গড়া সেনা বাহিনীর সদস্য, তাঁরই হাতে গড়া মানুষ। জানিনা তাঁর মনে তখন কি প্রশ্ন জেগেছিল। কিছু জানার উপায় নেই, কারণ ও বাড়ীতে তো কেউ বেঁচে ছিল না।

ক্ষমতার লোভে ক্ষমতায় যিনি থাকেন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করেন। এমন ঘটনা পৃথিবীতে বহু ঘটে। কিন্তু একটা পরিবারের সকলকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। সেই

ছোট্ট ১০ বছরের রাসেলকে পর্যন্ত হত্যা করা। শুধু একটা পরিবারতো না। ঐদিন একসাথে ৩২ নাম্বারে যেমন আক্রমন করেছে, তেমনি আমার মেজ ফুপুর বাসা, সেখানে আক্রমন করে শেখ ফজলুল হক মনি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মনিকে হত্যা করেছে। আমার সেজ ফুপুর বাসা, সেখানে আক্রমন করে। সেখানে আমার ফুপা আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, তাঁর ছেলে প্রায় রাসেলের বয়সী ছিল আরিফ, তাঁর মেয়ে ১৩ বছরের দেবীকে হত্যা করেছে। ৪ বছরের নাতী সুকান্ত, সে আবুল হাসান আবদুল্লাহর ছেলে, তাকে হত্যা করেছে। আমার ফুপুর ভাতুষ্পুত্র শহীদ সেরনিয়াবাত, তাকে হত্যা করেছে। এভাবে ঐ পরিবার ওখানেও যারা উপস্থিত ছিল গুলি খেয়ে আমার ফুপু নিজে আহত, আমার ফুপাতো বোন বিউটি আহত, রিনা আহত ছিল। খোকন ফুপাতো ভাই সে গুলি খেয়ে আহত। ঐ বাড়ীতে কাজের লোকজন থেকে শুরু করে এমনি যারা বেড়াতে এসেছিল যেমন রিন্টু, তাকে হত্যা করেছিল। এইভাবে সেই বাড়ীতে তারা মেসাকার করে। আমার ছোট ফুপুর বাড়ী সেখানেও তারা যায়। সেখানে গিয়ে আমার ফুপাকে খুঁজে। ফুপা ঠিক তখন ঘরে ছিলেন না। তাকে পায়নি। আমার ফুপুকে গৃহবন্দী করে রাখে প্রায় ৩ মাস।

আমার ফুপাকে পরবর্তীতে এরেষ্ট করে নিয়ে যায়। তিনি যখন শুনলেন সবাইকে মেরে ফেলে দিয়েছিলেন তখন তিনি বললেন,''আমার আর বেঁচে থাকার কি আছে? আমার কি আছে।'' কারণ, জামালের স্ত্রী আমার ছোট ফুপুর মেয়ে। কাজেই তিনি তাঁর মেয়েকেও হারান। এভাবে একই সাথে আমাদের পরিবারের যাদেরই এখানে বাসা ছিল তাদের সবাইকে আক্রমন করে তাদেরকে এই হত্যাকান্ড চালায়।

১৫ই আগস্টের পর একটা অপপ্রচার চালান। একটা পরিবার খারাপ ছিল সেইজন্য তাকে হত্যা করেছি।

এটা যে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে। এটা যে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের বিরুদ্ধে একটা আক্রমন। এবং যেহেতু আমাদের মহান '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে যাদেরকে আমরা পরাজিত করলাম। সেই পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী তাদেরই যারা দোসর ছিল তাদের সাথে ষড়যন্ত্র করে এই হত্যাকান্ড ঘটানো হয়েছিল। যারা এ দেশের স্বাধীনতা চায়নি। তারাই এই হত্যাকান্ড ঘটায়। এটাই হচ্ছে বাস্তবতা।

আর দুর্ভাগ্য। এখানেই আমাদের দলে, আমার বাবার কেবিনেটের মন্ত্রী খন্দকার মোস্তাকসহ এর মধ্যে আরও অনেকে জড়িত ছিল এই ষড়যন্ত্রের সাথে। আসলে ঘরের শত্রুই বিভীষণ। ঘরের শত্রু ঘর থেকে সাহায্য না করলে বাইরের শত্রু সুযোগ পায় না। সেই সুযোগটা করে দিয়েছিল। যারা এর সাথে জড়িত তাদের অনেকেই আমাদের বাসায় আসা-যাওয়া করত। ডালিম, ডালিমের বউ, ডালিমের শাশুড়ী, ডালিমের শালী ২৪ ঘণ্টাই আমাদের বাসায় পড়ে থাকতো। উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া সবই। ডালিমের শাশুড়ীতো সকালে বাসায় আসত, সন্ধ্যা-রাত পর্যন্ত থেকে যেত। ডালিমের বউতো সারাদিনই আমাদের বাসায় থাকতো। তার শালী সবাই আমাদের বাসায় মেজর নূর মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন কর্নেল ওসমানির এডিসি হিসেবে কর্মরত ছিল। তখন কামালকেও কর্নেল ওসমানী এডিসি হিসেবে চিনত। ২ জন একসাথে কর্নেল ওসমানীর এডিসি হিসেবে কাজ করত। এরাতো অত্যন্ত চেনামুখ। কর্নেল ফারুক, কেবিনেটের অর্থমন্ত্রী মল্লিক সাহেব তখন তার শালীর ছেলে।

এভাবে যদি দেখি তো যে খুব দূরের না কিন্তু এরাই ষড়যন্ত্র করল। এদের সাথে জেনারেল জিয়া যে জড়িত ছিল। জিয়ার যে পারিবারিক সমস্যা ছিল। সেটা সমাধানের জন্য তার জন্য সেনাবাহিনীতে একটা পদ সৃষ্টি করে সেখানে তাকে দায়িত্ব দিয়ে রাখা হয়েছিল। তার পারিবারিক সমস্যা আমরা সমাধান করে দিয়েছিলাম এবং জিয়াউর রহমান তো প্রায়ই প্রতি সপ্তাহে তার স্ত্রীকে নিয়ে আমাদের ৩২ নম্বর বাড়ীতে যেত। এদের যাওয়াটাতে যে কোন আন্তরিকতার নাই। এখানে যে চক্রান্তের একটা লক্ষ্য। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা আমরা কেউ তো কখনও বুঝতে পারিনি। কারণ আমরা খুব খোলামেলা মানুষের সাথে মিশতাম। আমাদের বাসা সকলের জন্য অবারিত দ্বার। আমার মা তো কখনও সরকারি বাসায় আসেনি। তিনি ঐ ৩২ নাম্বার বাড়ীতেই থাকতেন। আব্বাও ওখানেই থাকতেন।

এই হত্যাকান্ডটাই হচ্ছে বাংলাদেশের ইতিহাসকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা। বাংলার মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। আর স্বাধীনতার যে মূল লক্ষ্য সেখানে থেকে বিছিন্ন করা। মুক্তিযুদ্ধের বিজয়কে একেবারে অর্থহীন করে দেওয়া।

আমরা যদি দেখি অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল। জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসল। মোস্তাক ক্ষমতায় ৩ মাসও থাকতে পারেনি। তাকে বিদায় নিতে হয়। যারা এইভাবে বেঈমানী করে, মোনাফেকি করে তারা কিন্তু আসলে থাকতে পারে না।

আমরা যদি দেখি, সেই ব্রিটিশদের যে নিয়ে আসল মীর জাফর। নবাব হবে সেই লোভে বেঈমানি করে নিয়ে আসল মীর জাফর। মীরজাফরও কিন্তু ক্ষমতায় ৩ মাসও থাকতে পারেনি।

কারণ, যারা ব্যবহার করে তারা ঘটনা ঘটাবার জন্য ব্যবহার করে। তারপর আর বেঈমানদের রাখে না। মোস্তাকও থাকল না। কারণ মোস্তাক রাষ্ট্রপতি হওয়ার সাথে সাথে জিয়াউর রহমানকে সেনা বাহিনীর প্রধান করল। এতে খুব স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তাদের সাথে যে একটা যোগসূত্র ছিল। ষড়যন্ত্র মধ্যে যে তারা জড়িত ছিল। মোস্তাকের কাছে বিশ্বস্ত। এটা স্পষ্ট বোঝা যায়।

আবার সেই জিয়াউর রহমানই নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করল। একধারে সেনাপ্রধান, একাধারে রাষ্ট্রপতি এবং সংবিধান লংঘন করে সে এভাবে নিজেকে রাষ্ট্রপতি করে এদেশের নির্বাচনকে প্রশ্নবিধ করা, নির্বাচনে কারচুপি থেকে শুরু করে যতরকম অপকর্ম করা যায় করেছে। এদেশে ঋণ-খেলাপী তৈরি করা, দুর্নীতি সৃষ্টি করা। অর্থাৎ এরা ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার জন্য সেনাবাহিনীর অফিসার, সৈনিক, বিমান বাহিনীর অফিসারসহ হাজার হাজার অফিসারকে ও সৈনিকদেরকে হত্যা করল। একটার পর একটা ক্যু হয়েছে বাংলাদেশে। ১৯টা ক্যু হয়েছে বাংলাদেশে। '৭৫ এর পর থেকে বার বার ক্যু হয়েছে। আর প্রত্যেকটা ঘটনার পর সেনা অফিসার, বিমান বাহিনীর অফিসারদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে।

'৮১ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যে কাউন্সিল করে সেই কাউন্সিলে আমার অবর্তমানে আমাকে সভাপতি করে। কখনও এতো বড় একটা দলের দায়িত্ব আমাকে নিতে হবে এটা আমি কখনও চিন্তা করিনি। রাজনীতি করেছি। ছাত্রলীগের শুধু একটা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের কমিটির একটা সদস্য মাত্র ছিলাম। আজকে যেটা বদরুন্নেসা কলেজ এখন সেটা ইডেন ইন্টারমিডিয়েট কলেজ। সেই কলেজের ভিপি ছিলাম। ছাত্রলীগের যখন যে পদে প্রয়োজন। কলেজ ইউনিটের কখনও সেক্রেটারি ছিলাম,

প্রেসিডেন্ট ছিলাম। এভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত আন্দোলন মিছিল-মিটিং এ জড়িত ছিলাম। কিন্তু আমরা বা আমাদের পরিবারের এটা নিয়ে আমরা কখনও চিন্তা করিনি। আমরা শুধু চিন্তা করতাম যে, আমাদেরকে সংগঠনটা নিয়ে। আন্দোলন সংগ্রাম করতে হবে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সেই চিন্তা চেতনা থেকে আমি, কামাল, জামাল সবাই আমরা প্রত্যেকে সেভাবে রাজনীতি করেছি।

১৫ই আগস্ট যখন জার্মানিতে ছিলাম তখন জানিনা কি হবে ভবিষ্যৎ। কারণ কোথায় যাব? কি হবে? কারণ আমার স্বামী একটা স্কলারশীপে রিসার্চের জন্য সেখানে গিয়েছিল। তার আয়টা সীমাবদ্ধ। সেখানে দীর্ঘদিন চলার মত অবস্থা নাই। আর আমাদের এমন বিদেশেতো কিছুই ছিল না যে সেখান থেকে কোনভাবে আমরা দিনযাপন করতে পারি। আর তার উপর সেখান থেকে বার বার এমন এমন লোক আমাদের খোঁজ নেওয়া শুরু করল।

তখন আমাদেরকে শেল্টার দিয়েছিলেন হুমায়ুন রশিদ সাহেব। ওখানে যিনি এমব্যাসেডর ছিলেন। তখন আমাদের খবর নিলেন মার্শাল টিটো। পৃথিবীর অনেক দেশ এবং জার্মান গভর্মেন্টও আমাদের এ্যাসাইলাম দিতে প্রস্তুত। তারা খবর দিল। পৃথিবীর অনেক দেশ থেকে আমাদের খবর আসল। তখন মার্শাল টিটো ও মিসেস গান্ধী সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠালেন। আমরা তখনও জানিনা কি ঘটনাটা বাংলাদেশে ঘটে গেছে। কতজন মারা গেছে, অতটা জানতে পারিনি। যখন শুনলাম তখন এটা সহ্য করা আমার পক্ষে কষ্টকর ছিল। ১৬ তারিখে ড. কামাল হোসেন আসলেন 'বন'-এ হুমায়ুন রশিদ সাহেবের বাসায়। রেহানা ছোট। রেহানা তার হাত চেপে বলল, চাচা আপনি মোস্তাকের মন্ত্রীত্ব নেবেন না? আপনি প্রেস কনফারেন্স করেন। আপনি এই হত্যার প্রতিবাদ করেন।

হুমায়ুন রশিদ সাহেব প্রেস ডেকে ব্যবস্থা নিলেন। কিন্তু উনি (ড. কামাল) কোন কথা বলতে রাজি হলেন না। এ হত্যাকান্ডকে কনডেম করা বা এর বিরুদ্ধে কিছু বলা। একটা কথাও তিনি বললেন না। চলে গেলেন। বাইরে বিদেশে উনার কোথায় যাবার কথা ছিল। চলে গেলেন।

তখন হুমায়ুন রশিদ সাহেব যেহেতু মোস্তাক প্রেসিডেন্ট হয়ে গেছে। তিনি নিজে আমাদেরকে নিয়ে প্রেসের সামনে বসলেন। এই হত্যাকান্ডকে কনডেম করলেন। তার খেসারতও তাকে দিতে হয়েছে।

এরপর মিসেস গান্ধী আমাদের যখন মেসেজ পাঠালেন, আমরা চলে আসলাম। একটা আশা নিয়ে যাহোক দেশের কাছে আসি। দেশের কাছে যাই। এখানে আসলে আমরা ডিটেইল খবর পাব। আর কেউ যদি বেঁচেও থাকে কারণ কখনও শুনি মা বেঁচে আছে, কখনও শুনি রাসেল বেঁচে আছে। একেক সময় একেক রকম খবর শুনতাম। কখনও সঠিক খবর কিছু জানতাম না। আশা নিয়ে চলে আসলাম। যদি কেউ বেঁচে থাকে। নিশ্চয়ই আমরা পাব তাকে। যেয়ে অন্তত:, আমরা জানি ওরা হয়ত ইন্ডিয়াতে চলে আসবে। কাজেই সে কথা চিন্তা করে চলে আসলাম।

আমরা ২৪শে আগস্ট দিল্লিতে পৌঁছালাম। মিসেস গান্ধী ভারতের প্রাইম মিনিষ্টার তিনি আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। আমাদের ডাকলেন। সেখানে উনার কাছ থেকে শুনলাম। তিনি আমাদের বললেন, কেউ বেঁচে নেই।

আমাদের হুমায়ুন রশিদ সাহেব আগেও বলেছিলেন। কিন্তু সেকথা আমি রেহানাকে বলতে পারিনি। আমি বলিনি রেহানাকে যে, কেউ বেঁচে নেই। কিন্তু ওর মনে একটা আশা ছিল, হয়ত কেউনা কেউ বেঁচে থাকবে।

দিল্লিতে মিসেস গান্ধী আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। ওয়াজেদ সাহেবকে ওখানকার এটমিক এনার্জি গবেষণায় একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিলেন। বাড়ী-আমাদের জন্য বাড়ী-গাড়ী সব ব্যবস্থাই করে দিলেন। সে সব কথা আমি বলতে পারব না।

তখন দেশের সাথে যোগাযোগ নাই। কারও সাথে তেমন কোনও যোগাযোগ নাই। তাছাড়া আমাদের পার্টির সবাই তো তখন জেলে। আর আত্মীয়-স্বজন, কে কোথায়, আস্তে আস্তে যে যেখানে বেঁচে ছিলেন সবাই আমার কাছে ইন্ডিয়াতে চলে গেছেন শেল্টার নিতে। আমার মেজ ফুপু, সেজ ফুপু চলে গিয়েছিলেন। আমার সেজ ফুপু অনেক দিন হাসপাতালে ছিলেন। যখন একটু সুস্থ হয়েছেন। তখন আমার কাছে চলে গিয়েছিলেন।

আমি চাই না যেভাবে আমরা একদিনে সব হারিয়েছি এরকম কেউ হারাক। আমরা চাইনা। কারণ কষ্টের যন্ত্রনাটা কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। ২/৩ টা বছর কিভাবে কেটে গেছে সেটা বলতে পারব না। তবে ধীরে ধীরে একটা জিনিস সব সময় মনে হতো যে, এদেশের মানুষ যাদের জন্য আমার আব্বা রাজনীতি করতেন, যাদের জন্য স্বাধীনতা এনেছিলেন। তাদের জন্য কি করা যায়। কি করতে পারি। আমরা দুই বোন ঠিক করেছিলাম যে, আমাদের যা কিছু আছে আমরা সব নিয়ে একটা ট্রাস্ট করি। আমরা সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করব। তাদেরকে দিয়ে দেব।

'৮০ সালে রেহানাকে আমার চাচা খোকা কাকা নিয়ে গেলেন। বিশেষ করে জহুরুল ইসলাম সাহেব তখন লন্ডনে ছিলেন। তিনি খোকা কাকাকে পাঠালেন যে, টিকিট নিয়ে যে, 'তুই যা মেয়ে দু'টোর খবর নিয়ে আয়।' রুহুল কুদ্দুস সাহেব, আব্বার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী ছিলেন, উনিও খোঁজ নিতেন লন্ডনে। আরও অনেকে আমাদের পার্টির যারা খোঁজ-খবর নিতেন।

খোকা কাকা আসল। তারপর রেহানা তার সাথে চলে গেল। '৭৭ সালের প্রথম দিকে। রেহানার বিয়েও ওখানে হল কারণ জিল্লুল কাকা এই বিয়েটার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আব্বা ছিল, দেখেছিল। কিন্তু কথা ছিল যে, রেহানা পড়াশুনা করে বি.এ পাশ করে এম.এ করবে। তখন বিয়ে করবে।

যা হোক সেসময় '৭৭ সালে ওরা জার্মানী যায় শফিক সেখান থেকে লন্ডনে যায়। সেখানে বিয়ে হয়। রুহুল কুদ্দুস সাহেব আমার চাচা জহুরুল ইসলাম সাহেব হাতে গোনা কয়েকজন সবাই না। আরও অনেকেই ছিলেন কিন্তু কেউই তেমন খোঁজ নেননি। সেখানে বসে সাদামাটা বিয়ে হয়।

'৮০ সালে ও যখন সন্তান-সম্ভাবা, আমি তখন লন্ডন যেতে চাই কারণ বিয়ের সময় যেতে পারিনি। কারণ একনাম্বার, যাওয়ার মত আর দুই ছেলে-মেয়ে নিয়ে যাব সে টিকেটের টাকা আমাদের ছিলনা। তারপর ওখানে গিয়ে কোথায় থাকব? কি করব? দুই বাচ্চা নিয়ে থাকা, সেটাও সম্ভব ছিল না। আর ওখানকার বাসায় রেহানাই ছিল। কাজেই ওখানে এতোবড় বাসা না যে, ওখানে যেয়ে থাকতে পারি।

বলার মতো, চলার মতো, এমন কোন সঙ্গতি আমাদের ছিল না। ওর বিয়েতে যেতে পারলাম না। বাপ-মা হারা এক... ঐ অবস্থায় বিয়েটা হল। ওর যখন বাচ্চা হবে আমি মিসেস গান্ধীকে বললাম যে, আমি যেতে চাই রেহানার কাছে। উনি আমাকে টিকেটের ব্যবস্থা করে দিলেন, আমি গেলাম সেখানে।

তো '৮০ সালে যেয়ে দেখলাম যে, আমাদের এমন অবস্থা আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা নীচে নামতে পারে না। ব্রিকলেনে যেতে পারে না। নাম নিতে পারে না। এমন একটা অবস্থা ছিল। তাদের ছুরি নিয়ে মারতে আসত। কারণ '৭১-এর অনেক রাজাকার পরিবার তখন চলে গিয়েছিল লন্ডনে। তারা ওখানে গিয়েই ছিল।

জিয়াউর রহমান তখন ক্ষমতায়। জিয়াউর রহমানের ওরকম একটা নির্দেশই ছিল। এমনকি রেহানার পাসপোর্টটা জিয়াউর রহমান রিনিউ করতে দেয়নি। যার জন্য এ্যাসাইলাম নিয়ে, ব্রিটিশ গভর্মেন্ট এ্যাসাইলাম দিল। পরে সিটিজেনশিপও দিয়ে দিল। পার্সপোর্টটাও রিনিউ করতে দেয়নি জিয়া। তার নির্দেশ ছিল আমরা যেন দেশে আসতে না পারি।

'৮০ সালে ওখানে যেয়ে আমি মোটামুটিভাবে আমাদের সংগঠন ছাত্রলীগ, বিশেষ করে যুবলীগ গড়ে তুলি। মহিলা আওয়ামী লীগ সংগঠন গড়ে তুলি। আওয়ামী লীগকে গড়ে তোলার জন্য প্রায় ইংল্যান্ডের বিভিন্ন জায়গায় আমরা ঘুরে ঘুরে যাই। তো সকলেরই আর্থিক অসঙ্গতি ছিল। আমাদের অনেক কষ্ট করেই যেতে হতো। সেই ট্রেনে চড়ে, বাসে চড়ে। সমস্ত ইংল্যান্ডে যে ওল্ডহ্যাম, ম্যানচেষ্টার, বেডফোর্ড থেকে শুরু করে লোটন, বার্মিংহাম এরকম বিভিন্ন জায়গায় আমরা ঘুরে ঘুরে প্রবাসী বাঙালিদের নিয়ে লন্ডনে সংগঠন গড়ে তুলি। বেশ শক্তিশালী একটা সংগঠন হয়।

যেখানে নোবেল লরিয়েট শন ম্যাকব্রাইট যিনি আয়ারল্যান্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন এবং স্যার টমাস উইলিয়াম তার সাথে রেহানা আগেই যোগাযোগ করেছিল। আমরা বঙ্গবন্ধু হত্যার ইনকুয়ারি করার জন্য একটি ইন্টারন্যাশনাল ইনকুয়ারি কমিশন গঠন করি। এই কমিশনের পক্ষ থেকে স্যার টমাস উইলিয়াম বাংলাদেশে আসতে চেয়েছিলেন কিন্তু জিয়াউর রহমান তাকে ভিসা দেয়নি। আসতে দেয়নি। সে যেন ইনকুয়ারি করতে না পারে সেজন্য তাকে ভিসা দিল না। যাহোক আমরা জনমত সৃষ্টির জন্য যেখানে যতটুকু

সম্ভব দেশ-বিদেশে যোগাযোগ করি। আওয়ামী লীগ ও আমাদের পরিবারের সবাই মিলে চেষ্টা করি।

এরপর '৮০-র শেষে আমি ফিরে আসি আবার দিল্লিতে। ওখানে দীর্ঘদিন থাকার মত আর্থিক অবস্থা আমাদের ছিল না । আর ওখানে থাকার জন্য বার বার কারও কাছে চাওয়া, হাত-পাতা, এটাও আমার কাছে ভাল মনে হত না।

'৮১ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে আমি হঠাৎ লন্ডন থেকেই ফোন পেলাম। মাহবুবুর রহমান ছিলেন তখন আমাদের আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট। উনি ফোন করলেন আমাকে যে, তোমাকে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী নির্বাচিত করা হয়েছে। আমি একটু রাগ করলাম। আমি তো কোন পদ চাইনি কখনও। আমি লন্ডনে থাকতে আমার কোন পদ লাগেনি। আমি আমার সাধ্যমত কাজ করে সংগঠন করেছি। আমারতো পদের প্রয়োজন হয় নাই।

কারণ লন্ডনে গিয়ে প্রথম পাবলিক বক্তৃতা দেই। এর পূর্বে ১৯৭৯ সালে সুইডেনে। সুইডেনে যিনি আমাদের এমব্যাসেডর ছিলেন ড. রাজ্জাক সাহেব। উনি '৭৫ এর পর মোস্তাক গভর্মেন্টকে অস্বীকার করে পদত্যাগ করেন। এবং সেখানে তিনি বাকশাল সংগঠন গড়ে তোলেন। তারা একটা কনফারেন্স করেন। সেই কনফারেন্স রেহানা যায়। টেলিফোনে রেহানার সাথে আমার কথা হয় এবং কি কি বক্তৃতা দিবে তার একটা মোটামুটি ঠিক করে দেই।

রেহানা '৭৫-এর পর প্রথম যে রাজনৈতিক বক্তব্য, সেটা রেহানা সুইডেনের সেই অনুষ্ঠানে দিয়ে শুরু করে।

এভাবে আমরা ধীরে ধীরে রাজনৈতিক কাজগুলি শুরু করি। আমার কথা ছিল, আমার কোন পদ লাগবে না। কিছু লাগবে না। সংগঠনের জন্য, দেশের জন্য যেটুকু করার করব। যা হোক আওয়ামী লীগ যখন আমাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করল। প্রথমে একটু রাগ করলাম, তাও ঠিক। আবার মনে হলো, এই সংগঠনতো আমাদের গড়ে তুলতে হবে। কারণ মোস্তাক তখন নতুন দল বানিয়েছিল। আমাদের পার্টি ভাঙ্গার চেষ্টা করল। জিয়াউর রহমান এসে এমন অকথ্য অত্যাচার নির্যাতন শুরু করল। বহু নেতা-কর্মীকে ধরে ধরে এমন এমন টর্চার করে ছেড়ে দিয়েছে যে কিছুদিন পর মারা গেছে

অথবা কেউ নির্যাতিত অবস্থায় মারা গেছে। এরকম বহু নেতা-কর্মীর খবর আমরা পেতাম।

কাজেই একথাটা সবসময় বলতাম। ঠিক আছে আমি যাব। এখান থেকে সবাই গেলাম। আমি শর্ত দিয়েছিলাম যে, কাউন্সিলে একজন আওয়ামী লীগের নেতাও যদি আপত্তি করে আমি কিন্তু থাকব না। তাছাড়া এতো বড় একটা সংগঠন করার অভিজ্ঞতাও আমার ছিল না। ছাত্রলীগ করেছি, কলেজ ছাত্রলীগের সেক্রেটারি ছিলাম, প্রেসিডেন্ট ছিলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রোকেয়া হলের সেক্রেটারী হিসেবে সংগঠন করেছি। সারা ঢাকা শহরে যত মহিলা কলেজ ছিল, যেয়ে যেয়ে সংগঠন করে এসেছি। এটুকুই ছিলাম।

আন্দোলন, সংগ্রাম, মিটিং, মিছিলে ছিলাম। কিন্তু আওয়ামী লীগের মত বিশাল সংগঠনের দায়িত্ব নিতে হবে এটা ভাবিনি। কৃতজ্ঞতা জানাই আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী অনেক প্রবীণ, অনেকেই এখন নেই যাদেরকে এসে আমি পেয়েছিলাম। অনেকেই বয়সের ভারে মারা গেছেন। তাদের অনেকেই এখন নেই। বয়সের ভারে মারা গেছেন। তাদের কাছ থেকে অনেক সাহায্য সহযোগিতা আমি পেয়েছি।

পার্টির অবস্থা এমন ছিল যে, একেবারে দুই ভাগে বিভক্ত। এমন একটা অবস্থা ছিল যে, চিন্তাই করা যায় না। একেবারে প্রতিটি জায়গায় পার্টি বিভক্ত। আওয়ামী লীগ ব্রেকেট অমুক, আওয়ামী লীগ ব্রেকেট অমুক। এরকম দুই/তিনটা ভাগে বিভক্ত ছিল। আমার চেষ্টা ছিল একদিকে সংগঠনকে নতুন ভাবে ঢেলে সাজানো ও গড়ে তোলা। আর সেই সাথে সাথে জনগণের কাছে আওয়ামী লীগ সম্পর্কে বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে এতো অপপ্রচার ছিল তখন। সেই অপপ্রচারগুলির জবাব দেওয়া। কারণ, স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ তিনি গড়ে তুলেছিলেন। যে দেশে কিছুই ছিল না। এটা ছিল একটা প্রদেশ। তার উপর শোষন বঞ্চনা ছিল। এদেশে তখন প্রায় ৮০-৯০ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। এদেশের মানুষ তখন একবেলা খাবার জোটাতে পারে না। এইরকম একটা অবস্থা যেখানে। সেইখানে এই অবস্থায়, তার উপর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ। রাস্তা-ঘাট, পুল-ব্রিজ সবকিছু বিধ্বস্ত।

মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে অসাধ্য সাধন করে গিয়েছিলেন জাতির পিতা আমার বাবা। এটা যদি কেউ একবার ভালভাবে গবেষণা করে দেখে, দেখবে। আমার মনে হয় না পৃথিবীর কোন দেশের কোন নেতা এত অল্প সময়ের মধ্যে একটা বিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তুলে নিয়ে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে তার অবকাঠামোগত সকল কিছু যত আইন-কানুন নীতি, বিধিমালা এবং সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ প্রত্যেকেরই অধিকার সুরক্ষিত করে গেছেন। এমনকি আমাদের সমুদ্রসীমা আইন, স্থল সীমানা চুক্তি করা। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে গড়ে তোলা, আমাদের বিডিআর অর্থাৎ বর্ডার গার্ড গড়ে তোলা, পুলিশ বাহিনীকে গড়ে তোলা, আনসার গড়ে তোলা। সবগুলি পদক্ষেপ এই অল্প সময়ে গড়ে তোলা। সেই সাথে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা, শহীদ পরিবারগুলোকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া থেকে শুরু করে উনি কিনা করে গেছেন। তারপরও একদল লোক বলতো যে, উনি ভাল নেতা ছিল কিন্তু ভাল প্রশাসক ছিলেন না। তাই যদি না থাকে, তাহলে কি করে সাড়ে তিন বছরের মধ্যে এতগুলি কাজ তিনি করে গেলেন? একটি সংবিধান উনি দিয়ে গেলেন?

আর সেই সাথে সাথে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে, আজকে যখন রাষ্ট্র চালাতে যাই তখন প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি জায়গায় প্রয়োজনীয় সমস্ত আইনগুলি তিনি করে দিয়ে গেছেন। সবকিছুতে তিনি সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছেন। এখনও আমরা যা করে যাচ্ছি তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেই তো করে যাচ্ছি। সেইসাথে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারও তিনি শুরু করেছিলেন।

আর তারপর ওই অপপ্রচার এবং আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যত অপপ্রচার। পরিকল্পিতভাবে ছিল এই অপপ্রচারগুলি।

আমার এটাই কাজ ছিল এই অপপ্রচারগুলির জবাব দেওয়া। সংগঠন কে সুসংগঠিত করা। সহ-সংগঠনগুলিকে সুসংগঠিত করা। জনমতকে যারা বিভ্রান্তির বেড়াজালে ফেলে দিয়েছিল। ইতিহাস বিকৃত করে। নইলে স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে সাথে দীর্ঘদিন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে, মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে যে দেশ স্বাধীন হলো, আর সেই দেশে একটা বাঁশির ফু দিল একজন, ঘোষণা দিল আর অমনি স্বাধীন হয়ে গেলো ? তো এই যে একটা অপপ্রচার এর জবাবগুলি দেওয়া।

আমার চলার পথ অত সহজ ছিল না। কারণ একে তো ব্রেকেট করা ছিল, স্বাভাবিকভাবে হয়ত আমি আসার পর জানিনা কে কিভাবে ভেবেছিলেন। অনেক চড়াই-উৎরাই আমাকে পার হতে হয়েছে। কারণ যে মাটিতে, আপনাদের একটু চিন্তা করা উচিত। যারা আমাদের পরিবারের সকল সদস্যকে হত্যা করেছে। তারা বহাল তবিয়তে আছে। তাদের বিচার করে নাই। জিয়াউর রহমান তাদেরকে পুরস্কৃত করেছে। বিভিন্ন দুতাবাসে চাকরি দিয়েছে। তারা হিরো হয়ে গেছে। খুনি! খুনিরা! তারা দুতাবাসে চাকরি পায়।

যারা ষড়যন্ত্রকারী তারা আছে। স্বাধীনতা বিরোধীরা! তখন তারা ক্ষমতায়। তাদের হাতে আমার পতাকা। তারাই তখন ক্ষমতার মালিক। তা এই এতগুলি ঘটনা যেখানে, সেখানে আমি ওই যে পারিবারকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছে। সেই পরিবারের একজন এসে এদেশে রাজনীতি করব। ক্ষমতায় যাব। এটাতো এতো সহজ না। কাজেই প্রতি পদে পদেই তো প্রতিবন্ধকতা ছিল।

কিন্তু আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার আওয়ামী লীগের তৃণমূল পর্যায়ের নেতা কর্মীদের। আজকে অনেকেই বেঁচে নাই। সে সময় যারা আমার পাশে থেকেছেন। তাদের স্নেহ, ভালবাসা, আস্থা সে সময় আমাকে শক্তি যুগিয়েছে। অনেক কাজ করতে শিখিয়েছেন। অনেকেই পরামর্শ দিয়েছেন। এভাবেই আস্তে আস্তে তো দলকে সংগঠিত করতে পেরেছি।

২১ বছর পরে কিন্তু আমরা ক্ষমতায় এসেছি। যেখানে কখনও ভাবতে পারিনি যে, '৭৫ এর পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসতে পারবে। এটাই বলতো যে, আওয়ামী লীগ কখনও ক্ষমতায় আসতে পারবে না। শতবছরেও কখনও ক্ষমতায় আসতে পারবে না। একথাও আমাদের শুনতে হয়েছে। সেই আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় শুধু আসা না, ক্ষমতাটা আমাদের কাছে ক্ষমতা না। এই ক্ষমতাটা আমাদের কাছে একটা শক্তি যা দিয়ে দেশের উন্নতি করা যায়। আর সেটা আমরা প্রমান করতে পেরেছি। জাতির কাছে প্রমান করতে পেরেছি।

যে দেশে ৯০ ভাগ মানুষই দরিদ্র ছিল। আজকে আমরা যদি '৭০ সালের হিসাব দেখি। আর আজকে অন্তত সেই দারিদ্র্যের হার কমাতে পেরেছি। যখনই একটা কাজ করি, যখনই মনে হয় এই কাজটায় মানুষ ভালো থাকবে। মানুষের সমস্যাগুলি দূর হবে। তখনি মনে হয় আব্বা নাই, তাঁর আত্মা শান্তি পাবে। নিশ্চয়ই তিনি বেহেশত থেকে দেখেন যে, তাঁর মানুষগুলি ভালো আছে। যখনই দেশের জন্য, মানুষের জন্য একটা ভালো কাজ হয় তখন কিন্তু আমার মনের মধ্যে সেই কথাটাই আসে। আমি কাজ করি ঐ একটা চিন্তা করেই।

আমার বাবা-মা এতো কষ্ট করে গেছেন। আমার মা পাশে থেকে থেকে যে শক্তি সাহস প্রেরণা দিয়েছেন। আমার মা'র তো জীবনে কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল না। আমার মা কোনদিন আমার আব্বাকে কোন জিনিসের জন্য বিরক্ত করেনি। বরং নিজের যে টাকা বা সম্পদ, বিশাল সম্পত্তি তাঁর দাদা তাকে দিয়ে গিয়েছিলেন সেখান থেকে যা উপার্জন করতেন সবই কিন্তু আমার আব্বাকে দিয়ে দিতেন। নিজের জন্য একটি পয়সাও কোনদিন খরচ করেননি। নিজে কোনদিন কিছু চাননি। বরং ছায়ার মত আব্বার পাশে থেকে তাঁর এই সংগঠনকে সাহায্য করতেন।

তিনি জানতেন যে, একটা সুনির্দিষ্ট আদর্শ নিয়ে আমার আব্বা কাজ করেন। ঠিক সেইভাবে তার পাশে থেকে থেকে তিনি তার সারাটা জীবন ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। কি-বা আমার মার বয়স ছিল। অথচ একটু চিন্তা করলে যে, ঐ বয়সে মাসের পর মাস স্বামী জেলে। ছেলে-মেয়ে সংসার সবকিছু একদিকে দেখা, সংগঠনের সকলের খোঁজ-খবর নেয়া। এমনকি যারা ঐ সময় বেঈমানি করেছে। তারা যখন জেলে থাকত। আমার মা নিজে বাজার করতে না পারলেও তাদের পরিবার, তাদের ছেলেমেয়ে যেন না খেয়ে না থাকে, তাদের জন্য সাহায্য পাঠাতেন। নিজের সংসার যেন নিজের সংসারের মধ্যে ছিল না। আওয়ামী লীগ সংগঠনটাই যেন আমার মার নিজস্ব একটা পরিবার। কার অসুখ তাকে চিকিৎসার ব্যবস্থা এমনকি টিবি রোগী, তাকেও হাসপাতালে আমার মা নিজে দেখতে গেছেন। আমার আব্বা দেখতে গেছেন। এইভাবে আমি দেখেছি। আব্বা জেলে থাকতে এই সংগঠনকে সুসংগঠিত করা এবং সমস্ত আন্দোলন-সংগ্রাম চালানো সবকিছু আমার মা নিরবে করে গেছেন। কোনদিন তো প্রচারেও আসেননি বাইরেও আসেননি।

তো এভাবেই সারাটা জীবন কিন্তু এই দেশের স্বাধীনতার জন্য এবং স্বাধীনতার পরে সবসময় কিন্তু উনি মহান ত্যাগ স্বীকার করে গেছেন। হয়ত! ইতিহাস তো আব্বার কথা অনেক লেখে। মার কথা কতটুকু জানবে? উনি পিছনে থেকে কত ত্যাগ স্বীকার করে গেছেন। আমাদেরকেও সেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। আজকে আমাদের লেখাপড়া যা কিছু তিনিই তো শিখিয়েছেন। তিনিইতো নিয়েছেন দায়িত্ব।

যেদিন ৩০শে জুলাই আমি দেশ ছেড়ে যাই। আমি আর রেহানা। জানিনা মানুষ বিদেশে যাওয়ার আগে কত ফুর্তি। একটা সময় বিদেশে যাওয়া একটা স্বপ্নের মত ছিল। কিন্তু সেইবার বিদেশে যেতে যেয়ে। আমি জানিনা আমরা কিছুতেই মন টানছিল না যেতে। চাইছিল না কিন্তু যেতে হল। ঐ তেজগাঁও এয়ারপোর্ট থেকে আমরা দিল্লিতে, দিল্লি হয়ে জার্মানিতে ফ্রাঙ্কফুটে গেলাম। সবাইকে রেখে গিয়েছিলাম। রাসেল, কামাল, জামাল, ওদের বউ সুলতানা, রোজী সবাই আসল এয়ারপোর্টে। আর এই ১৭ই মে যেদিন ফিরে আসি সেদিন লাখো মানুষ, হাজার হাজার মানুষ। সে হাজার মানুষের ভীড়ে যাদের ৩০ জুলাই রেখে গিয়েছিলাম তাদের কাউকে পাইনি।

আমি বনানীতে গিয়েছিলাম সারি সারি কবর। জানিনা আল্লাহ শক্তি দিয়েছেন সহ্য করতে। আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি। একটাই এই দেশটার জন্যইতো আমার আব্বা সারাটা জীবন কষ্ট করেছেন। আজকে কারাগারে যেখানে তিনি ছিলেন, এখনতো সেটা উন্মুক্ত। আপনারা গিয়ে দেখে আসতে পারেন যে, কিসের মধ্যে কিভাবে তিনি থাকতেন। কাজেই দুঃখকে তিনি দুঃখ মনে করেননি। কষ্টকে কষ্ট মনে করেননি। বাংলাদেশের মানুষের কথাই ভেবেছেন। আমার আব্বা-আম্মা দু'জনই। কাজেই সে আদর্শ নিয়েই আমি ফিরে এসেছি। একটাই যে এদেশের মানুষের মুখে হাসি ফুটানো। সেটা যেন করতে পারি। শুধু এই টুকুই আমরা চাই। আর কোন চাওয়া পাওয়া আমাদের নেই। শুধু ওইটুকুই।

আমি দুঃখিত আমি আসলে এত কথা বলব কখনও চিন্তা করিনি। তবু মনে হয় যে আমাদের আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের অনেকের অনেক কিছু জানা উচিত। কারণ অনেকেরই আমি যখন এসেছি তখন জন্মই হয়নি। আর তখন যারা ছিল তারা বেঁচেই নাই।

শুধু একটা কথাই বলব। আমরা যারা রাজনীতি করি আমরা যদি জাতির পিতার দিকে তাকাই, তাঁর আদর্শকে ধারণ করে রাজনীতি করি। তাহলে আমরা দেশকে কিছু দিতে পারব, মানুষকেও দিতে পারব। মানুষ ধন-সম্পদের জন্য কত কিছু করে কিন্তু কি হয়? মৃত্যু হলেতো কিছু সাথে নিয়ে যেতে পারে না। শান-শওকত বিলাসিতার মধ্য দিয়ে জীবন অনেকে কাটাতে চায় কিন্তু মৃত্যুর পরে সবই মিথ্যা হয়ে যায়। কিন্তু মানুষের জন্য যদি কিছু করে যাওয়া যায় সেটাই কিন্তু সব থেকে বড় পাওয়া। তো আমার আব্বার কাছ থেকে সেটাই শিখেছি। আর সেই আদর্শ নিয়েই আজকে যতটুকু যা করি সেই শিক্ষা থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছি। এই দেশটাকে এমন একটা জায়গায় পৌঁছানো যেন আমার আব্বার আত্মাটা শান্তি পায়।

আমি দেশবাসীর প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাই। কারণ গ্রামে-গঞ্জে যখন ঘুরেছি তখন দেখেছি সাধারণ মানুষের ভালবাসা। সেই ভালবাসাই কিন্তু আমাকে আরও প্রেরণা দিয়েছে।

সাধারণ গ্রামের একটি ঘটনা বলি, চর ক্লার্কে তখন ঘূর্ণিঝড়ে আমরা রিলিফ দিতে গিয়েছিলাম। ছাত্রলীগের সবাই চলে গিয়েছে, আমি যাচ্ছি। আর পথ নাই। রাস্তার মধ্যে পানি। আমি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি। বৃদ্ধ (বুড়ি মতন) বয়স্ক মহিলা আমাকে ডেকে নিয়ে উনার মাটির ঘরে দাওয়ায় একটা খেজুর পাতার পাটিতে বসতে দিল। বাড়ীর উঠানে একটা নারকেল গাছ। ওখান থেকে একটা ডাব পেড়ে এনে বলল 'মা খাও'। আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে খালি বলল, 'বাপ আমাদের জন্য জীবনটা দিয়ে গেছে, তুমিও নামছ মা এ কাজে? তুমিও এরকম কষ্ট করে যাচ্ছো? তোমার বাপতো আমাদের জন্যই জীবনটা দিয়ে গেল।' এই যে একটা পন্ন কুটিরে একজন মানুষের যে অনুভুতি, এইটুকুইতো আমার সব থেকে বড় প্রেরণা যে, তাদের জন্যই তো আমার আব্বা সারা জীবন কষ্ট করে গেছেন।

কাজেই তাদের জন্য কিছু করে যেতে পারলেইতো সেটাইতো বড় সার্থকতা। ঠিক এভাবে গ্রাম গঞ্জে অনেক ঘুরেছি। যেখানেই গেছি সেখানেই সাধারণ মানুষগুলি, কত সময় গাড়ী যাচ্ছে হঠাৎ একটা বেঞ্চ এনে গাড়ীর সামনে আটকালো, কিছুই না। একটু নামতে হবে। নিয়ে একটা মোড়া বা একটা চেয়ার টেনে বসায়। ঐ একটু পান অথবা

একটা ডাবের পানি অথবা এক কাপ দুধ, একটু কলা, ফল। যা তার আছে সে তাই নিয়ে আসছে। 'খাও মা'। 'এতো কষ্ট করতেছো', গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়া, এই করা। 'বাপ নাই, মা নাই। এতো কষ্ট করে যাচ্ছো?' এই যে মানুষের ছোঁয়া এত ভালবাসা। এই ভালোবাসাটা পেয়েই আমি বুঝেছি। আমার আব্বা কিভাবে এতো সেক্রিফাইস করতে পেরেছেন। এতো কাজ করতে পেরেছেন। কারণ, তিনিতো মানুষের এই ভালোবাসার ছোঁয়া পেয়েছিলেন। আর সে জন্যই তিনি বাংলাদেশের মানুষগুলোর জন্য এতো ত্যাগ-স্বীকার করেছিলেন।

এমনকি সাধারণ মানুষ, গ্রামের মানুষ, হয়ত কৃষক কাজ করছে হাতে মাটি, সে চলে আসছে। এসে, তাদের সে হাতের পরশ, স্নেহ ভালবাসা সেটা আমি পেয়েছি। যেটা আমার আব্বাও পেয়েছিলেন। কাজেই সেই ভালোবাসার ছোঁয়াটা পেয়েছি। সেটাইতে আমার সবচেয়ে বড় শক্তি।

আজকে ৩৫ বছর শেষ হয়ে ৩৬ বছরে পাড়া দিলাম এই আওয়ামী লীগে। এত লম্বা সময় কেউ কখনও কোন দলের দায়িত্বে থাকে না। আমার মনে হয় আমাদেরও এখন নতুন নেতৃত্ব খোঁজা উচিত ভবিষ্যৎ-এ।

কারণ, এটা খুবই দরকার। মৃত্যুকে আমি পরোয়া করিনা এটা ঠিক। কিন্তু মৃত্যুতো আমি বার বার চোখের সামনে থেকে দেখেছি। বার বার আমার উপরে আঘাত এসেছে। কিন্তু আমি কখনও ভয়ও পাইনি ঘাবড়াইওনি তার জন্য। আমার একটা বিশ্বাসই ছিল যে, আল্লাহ জীবনটা দিয়েছেন, আল্লাহ এই দায়িত্বটা দিয়েছে। নিশ্চয়ই আমাকে দিয়ে কিছু কাজ করাবেন বলে। আর সেটা বোধ হয় আমার আব্বা-আম্মারই আকাঙ্ক্ষা, তাদেরই আশির্বাদ। সেজন্যই এটা করতে পারছি। না হলে আমার কি আছে? আমার কি জ্ঞান আছে? কি শিক্ষা আছে? আমি কি করতে পারি? কিন্তু কাজগুলো যে করতে পারছি এখানে নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও একটা শক্তি আছে।

আমি সবসময় এটা বিশ্বাস করি আমার আম্মা, আমার আব্বা একটা ছায়ার মত আমাকে নিশ্চয়ই দেখে রাখেন। উপরে আল্লাহ'র একটা ছায়া আমি পাই। নইলে ২৪শে জানুয়ারি '৮৮-এ যেভাবে আমার উপর গুলি চালানো হলো চট্টগ্রামে। এভাবে একবার না। বার বার কতযে আমাকে এভাবে কখনও গুলি কখনও বোমা নানাভাবে বাধা

দেওয়ার চেষ্টা এবং হত্যার চেষ্টা। তারপরওতো বেঁচে গেছি। বার বার। দুঃখ হয় সেই সাথে আমাদের কত নেতা-কর্মী মারা গেছেন। নিজেদের জীবন দিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে রেখে গেছেন।

আইভী চাচী চলে গেল। সেখানে আমাদের ২২ জন নেতা-কর্মী। ঠিক আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে গুলি করল আমাদের আরেকজন আলতাফ নামে একজন কর্মী মারা গেল। এরকম বহু মানুষ, ৩০ জনের মত মারা গেছে। চট্টগ্রামে যখন গুলি করে।

বহু মানুষের ত্যাগ রয়ে গেছে। হয়ত বাংলাদেশটাকে আমরা জাতির পিতার সে আকাঙ্ক্ষা ছিল সেভাবে গড়ে তুলতে পারলে তাদের আত্মাও শান্তি পাবে। কারণ আমাদের ভুললে চলবে না যে, ৩০ লক্ষ শহিদ এদেশের স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিয়েছে। ২ লক্ষ মা-বোন তাদের ইজ্জত দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। তাঁদের রক্তের ঋণ, যেমন আমাদের শোধ করতে হবে। সেইসাথে সাথে জাতির পিতা তিনি জীবন দিয়ে গেছেন এই দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে। হত্যার বিচার আমরা করেছি। কিন্তু আমি মনে করি যেদিন তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়তে পারব সেই দিনই আমার আব্বার আত্মা শান্ত হবে। আর ঐ খুনিদের উপযুক্ত জবাব, ষড়যন্ত্রকারীদের শুধু খুনি বলবনা ষড়যন্ত্রকারীদের উপযুক্ত জবাবটা সেদিনই দিতে পারব। এটাই হচ্ছে আমার একমাত্র চাওয়া।

আমি দুঃখিত। আমি অনেক লম্বা সময় নিলাম। আমি আওয়ামী লীগের কাছে কৃতজ্ঞ। বাংলাদেশের জনগণের কাছে কৃতজ্ঞ যে, এতবড় দায়িত্ব আমাকে দিয়েছিলেন। আর সেইদিন আমাকে আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট করেছিলেন বলেই কিন্তু তখন যে মানুষের ঢল নেমেছিল তখন আর আমাকে জিয়াউর রহমান বাধা দিয়ে রাখতে পারেনি। আমি ফেরত আসতে পেরেছিলাম। নইলে তো আসতে দিত না। বার বার অনেক বাধা ছিল যেন আমরা দেশে না আসতে পারি। দেশে আসার পর আমাকে তো ৩২ নম্বরে ঢুকতে দেয়নি। এমনি মিলাদটাও পড়তে দেয়নি। সিলগালা করা ছিল। আমাকে বলা হয়েছিল যে, অন্য একটা বাড়ী দেবে।

আমি বললাম যে, ‘কোন বাড়ীর লোভে আমি আসিনি’। কারণ, আমি আমার মেয়ের হাত ধরে আসছিলাম। দু’টো স্যুটকেস হাতে নিয়ে, আমার থাকার জায়গা ছিল না, কোথায় থাকব? কি করব? কিচ্ছু জানি না। কিন্তু আমি চলে এসছিলাম। এসে আমার ছোট ফুপুর বাসায় উঠছিলাম। কখনও ছোট ফুপুর বাসায় কখনও মেঝ ফুপুর বাসায়। এইভাবেই আমার দিন কেটেছে। আমি যে চলব আমার কোন গাড়ী নাই। আমার কোন ইনকাম নাই। আমার কিছুই নাই। ঠিক জানিনা, আমি কোন কিছু চিন্তা করি নাই এইগুলি।

আমার খালি মনে হয়েছে, আমাকে যেতে হবে। আমাকে কিছু করতে হবে। তো সেইভাবে আমি বাংলাদেশ ঘুরতে শুরু করি, বাস ভাড়া করে। বাস, মিনিবাস ভাড়া করে করে। কারণ আমাদের কোন গাড়ী ছিল না। বাস-মিনিবাস ভাড়া করে করেই বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ট্যুর ট্রেনে, লঞ্চে, নৌকায় পায়ে হেঁটে এভাবেই আমরা কিন্তু সফরে গেছি। এভাবে তিল তিল করেই কিন্তু এই সংগঠনটা গড়ে তোলা। আর সেই সাথে সাথে এদেশের মানুষের ভিতরে একটা আশা জাগানো। দেশের মানুষকে সঠিক ইতিহাসটা জানানো। আমরা যে স্বাধীন দেশ, স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে একটা সম্মানজনক অবস্থায় আন্তর্জাতিকভাবে নিয়ে যেতে হবে। কারণ জাতির পিতা বলতেন, যে, ভিক্ষুক জাতির কোন ইজ্জত থাকে না। আমরা ভিক্ষা করে খাব না। আমরা নিজের পায়ে দাড়াবো। আত্মমর্যাদাবোধ নিয়ে চলব। আত্মসম্মান নিয়ে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে চলব। এটাই ছিল লক্ষ্য। তবে আজকে এটুকু বলতে পারি। আজ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল। সেই সম্মানটা ফিরিয়ে আনতে পেরেছি। যেখানে বাংলাদেশকে একটা ভিক্ষুকের জাতিতে পরিণত করেছিল। কিন্তু সেই জায়গা থেকে আমরা সরে আসতে পেরেছি। এটাকে আমাদের ধরে রাখতে হবে। আর সেই সাথে এখনও দারিদ্র্য ২২ ভাগে আছে। সেটা আমাদের কমাতে হবে। তবেই আমি মনে করব আমার বাবার স্বপ্নটা সার্থক হবে।

আবারও সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আওয়ামী লীগের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। বাংলাদেশের জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। যারা সব সময় আমাকে সহযোগিতা করেছে। আর ষড়যন্ত্রকারীরা সবসময় যড়যন্ত্র করেই যাবে এটা আমি জানি। যেটা ছোটবেলা থেকেই আমার দেখা আছে। কাজেই ওটা আমি পরোয়া করি না। যতক্ষন বাংলাদেশের জনগণ আমার পাশে আছেন। উপরে আল্লাহ আছেন। আমার বাবা-মার দোয়া আশির্বাদ আছে। কাজেই আমরা আমাদের অভিষ্ঠ্য লক্ষ্য পৌঁছাবো। এ দৃঢ় বিশ্বাস আমার আছে।

খোদা হাফেজ
জয় বাংলা, জয়বন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...